**জি.এম ফসল এবং বিটি বেগুন চাষের কথকতা!**

জি.এম ফসল নিয়ে বিশ্বব্যাপী এক তর্কযজ্ঞ চলছে। এক পক্ষ এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে, আরেক পক্ষ এর সমালোচনায় বিভোর। এসব বিতর্কের মাঝেও বাংলাদেশে শুরু হয়েছে জি.এম ফসল হিসেবে পরিচিত বিটি বেগুনের চাষাবাদ। গাজীপুরস্থ বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট(বিএআরআই) বিটি বেগুনের উদ্ভাবক। সরকারীভাবে বাংলাদেশে বিটি বেগুন উৎপাদনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে; এ নিয়ে দেশের মধ্যেও বিতর্ক থেমে নেই। বাস্তবতা যা কিছু হোক না কেন জি.এম ফসল নিয়ে কিন্তু আমাদের অনেকের মধ্যেই তেমন কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই। এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে কিছু সম্যক ধারণা দেয়া এবং এ ব্যাপারে আমাদের করনীয় ঠিক করার লক্ষ্যেই আমার আজকের এই লেখার অবতারণা।

জি. এম (Genetically Modified)ফসল হচ্ছে এমন এক ধরনের ফসল যার মধ্যে বিশেষ কারণে অন্য একটা অসমগোত্রীয় প্রাণীর “জিন (Gene)” সন্নিবেশ করে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হয়েছে জৈব প্রযুক্তি পদ্ধতি Biotechnological Methods বা জৈব প্রকৌশল বিদ্যার (Genetic Engineering) মাধ্যমে। সাধারণভাবে অধিক উৎপাদন পাওয়ার লক্ষ্যে এবং বিশেষ ধরনের রোগ পোকা মাকড় ও আগাছার হাত থেকে সহজে সংশ্লিষ্ট ফসল বা সবজি কে রক্ষার জন্যে জি.এম ফসলের প্রবর্তন করা হয়ে থাকে। জি.এম ফসল প্রবর্তনের আরো কিছু সুনির্দিষ্ট সুবিধা রয়েছে; যেমন:

(১) অধিক পুষ্টি উপাদান সংযোজিত হতে পারে; (২) রোগ ,পোকা মাকড় ও আগাছা প্রতিরোধী হতে পারে; (৩) প্রতিকূল পরিবেশে জন্মাতে পারে; (৪) কোন বালাইনাশক ব্যবহার করা লাগবে না; (৫) সহজে পচবে না এবং অধিক সময় অব্দি সংরক্ষণ করা যাবে; (৬) বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা মন্দা রোধে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে কারণ ৩য় বিশ্বের দেশে প্রতি ২ সেকে-ে একজন করে শিশু মারা যায় অনাহারে, খাদ্যের অভাবে; (৭) কম জমিতে অধিক ফসল পাওয়া যায়।

 এ তো গেল জি.এম খাদ্যের সুবিধা এবার এ ধরনের খাদ্যের কিছু অসুবিধার কথা জেনে নেয়া যাক:

(১) জি. এম খাদ্যে যে বিশেষ ধরনের জিন সংশ্লেষ করা হয়ে থাকে সেটার অন্য কোন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে কিনা সেটা তেমন একটা বিবেচনা করা হয় না; (২) বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্য কোন ধরনের উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়ে আমাদের জীব বৈচিত্র্য কে ক্ষতি করতে পারে; (৩) কোন বিশেষ রোগ ও পোকা প্রতিরোধী জাত তৈরির ফলে কোন বিশেষ ধরনের সুপার রোগ পোকার জীবাণূ ও আগাছার সৃষ্টি হতে পারে; (৪) জি এম উদ্ভিদ নিকটবর্তী একই ধরনের জাতের সাথে পরাগায়নের মাধ্যমে আমাদের বিশেষ কৃষি পরিবেশ ক্ষতি করতে পারে; (৫) মানব স্বাস্থ্যের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।

 বস্তুত জি.এম খাদ্যের প্রথম প্রচলন শুরু হয় যুক্তরাষ্টে। ১৯৯৭ সালে ১৯৯৯ সালে মধ্যে আমেরিকার বাজারে যতগুলো প্রক্রিয়াজাত খাবার ছিল তার ৩ ভাগের ২ ভাগ ছিল জি.এম খাদ্য, ফলে এ বিষয়টি শেষতক আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট অব্দি গড়ালে সেটা সপ্রিম কোর্ট কর্তৃক বাজারজাত করণের অনুমতি প্রাপ্ত হয়। প্রথম বাজারজাতকৃত (১৯৯৪) জি.এম ফলের মধ্যে ছিল টমেটো । বর্তমানে আমেরিকার বাজার ৩০০০ হাজারের অধিক প্রক্রিয়াজকৃত খাবার পাওয়া যায় যার মধ্যে কোন না কোন ভাবে জি.এম খাদ্য হিসেবে খ্যাত সোয়াবিন তেলের সংমিশ্রণ আছে। আবার আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে আমদানীকৃত এবং ব্যবহৃত সোয়াবিন তেলও কিন্তু জি.এম প্রযুক্তির মাধ্যম উৎপাদিত। ১৯৯৬ সালে যুক্তরাজ্যে সুবিখ্যাত সুপার স্টোর J. Sainsbury and Safeway তে জি.এম খাদ্যের বাণিজ্যিকীকরণ শুরু করে। ২০০৩ সালে এক তথ্যানুসারে জি. এম ফসলের উৎপাদন হয় আমেরিকাতে ৬৩%., আজেন্টিনাতে ২১%, কানাডাতে ৬%. ব্রাজিলে ৪%. চীনে ৪% । বর্তমানে আমেরিকার বাজারে যেসব প্রক্রিয়াজাতকৃত খাবার পাওয়া যায় তার মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগই জি. এম খাদ্য। ১৯৯৫ সালে গোটা পৃথিবীতে জি.এম ফসলের উৎপাদন ছিল ৪.২ মিলিয়ন একর, সেটা ১০ বছরে ৫০ গুণ বেড়ে দাঁড়ায় ২২২ মিলিয়ন একর। গোটা পৃথিবীতে ব্যাপক ভাবে যে সবজি.এম প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত ফসলের মধ্যে রয়েছে: সরিষা, মধু, তুলা ও তুলার তেল, ধান , সোয়াবিন , আখ , ভূট্টা , মিষ্টি ভূট্টা, টমেটো, আলু , স্কোয়াশ , তামাক , পেঁপে , তিসি , সুগারবিট,মাংস এবং মাংস জাতীয় খাদ্য, সবজি তেল , মটরশুটি ইত্যাদি ।

 সকল দিক বিচার বিবেচনা করে আমেরিকার খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন(FDA: Food & Drug Administration) এবং কৃষি বিভাগ (USDA:United States Department of Agriculture) ৪০ টির ও অধিক জি.এম ফসল কে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের অনুমতি দিয়েছে এবং তারা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহল করেছে খাদ্যের মধ্যে ওষুধের গুণাগুণ সৃষ্টির যেমন: কলার মধ্যে হেপাটাইটিস বি প্রতিরোধী উপাদান সংশ্লেষ করা, দ্রুত বর্ধনশীল মাছ ও গাছ উৎপাদনের এবং প্লাস্টিক গুণসম্পন্ন গাছ সৃষ্টির, দ্রুত পাকে এমন ফল ফসল প্রবর্তনের এবং পোষা প্রাণীর মধ্যে ব্যাকটেয়িার এমন জিন সংশ্লেষ করা যে প্রাণীর মাংস খেলে মানব শরীরে এইডস প্রতিরোধী ÒLiving CondomÓ গুণাবলীর সৃষ্টি হবে, যেটি হবে ঘাতক ব্যাধি এইডস প্রতিরোধে মানব ইতিহাসের সেরা আবিষ্কার।

 উপর্যুক্ত আলোচনা হতে এটা আমাদের কাছে প্রতীয়মান যে, জি. ফসল উৎপাদন এটা সময় উপযোগী বৈজ্ঞানিক জৈব প্রযুক্তি। তাছাড়া এ ধনের খাবার খেয়ে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটেছে এমন কোন নজির আমরা শুনিনি। মানুষের প্রয়োজনে ক্ষুধামুক্ত ও রোগ প্রতিরোধী বেশী বেশী ভাল গুণাবলীর কারণে এই প্রযুক্তি তার আপনা মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, যাকে রোধ করা কঠিন হবে। আমরা যারা তৃতীয় বিশ্বের দেশের মানুষ, খাদ্য ও জীবন ধারনের অনেক উপকরণের জন্যে উন্নত বিশ্বের উপরে প্রতিনিয়ত নির্ভরশীল এটা থেকে মুক্ত থাকা আমাদের জন্যে অনেকটা অসম্ভব ব্যাপার। তবে আমাদের উচিত হবে, এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন খাবার বুঝে শুনে গ্রহণ করা আর এই প্রযুক্তির যারা উদ্ভাবক তাদের কাছে আমাদের আহবান যথাযথ পরিক্ষা করে এই ধরনের ফসল তৈরি করা যারা মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপরে খুব বিরূপ প্রতিক্রিয়া না পড়ে।

 এবারে বিটি বেগুন নিয়ে দু’চার কথা বলে আমার এ লেখা শেষ করবো। এ ব্যাপারে বিটি বেগুনের উদ্ভাবক বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের কিছু ভাষ্য নিচে তুলে ধরছি:

“কাঙ্খিত জাত উদ্ভাবনে চিরায়ত প্রজনন পদ্ধতির (Conventional) সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার জন্য পৃথিবীব্যাপী বর্তমানে জীব প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এতে কাঙ্খিত জাত পাওয়ার ক্ষেত্রে সময় এবং অর্থের সাশ্রয় হয়। এমনকি প্রচলিত পদ্ধতিতে যা আদৌ সম্ভব নয় তাও সম্ভব করা যায়। উন্নত দেশসমূহসহ পৃথিবীর নানান দেশে উদ্ভিদ জগতে কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধনের জন্য জিন কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত বিশ্বে উল্লিখিত জিএম ফসল চাষ বিগত বছর গুলোতে বহু গুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে এই প্রথম জিন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে বিটি বেগুন নামে বেগুনের কয়েকটি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। বেগুন অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্যমান সমৃদ্ধ সবজি যা সারা বছর পাওয়া যায়। এই সবজিটি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায় হিসেবে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা, যা প্রধান শত্রু পোকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আমাদের কৃষকেরা বেগুন উৎপাদনে উক্ত শত্রু পোকা দমনের জন্য এক মৌসুমে ১৬০-১৮০ বার স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর কীটনাশক প্রয়োগ করে থাকে। এতেও কৃষকের কাঙ্খিত উৎপাদন সম্ভব হয় না । এ কারণে চিরায়ত প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন না হওয়ায়, উন্নত বিশ্বে আবিষ্কৃত কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যের জিন Cry I Ac বাংলাদেশী ৯ টি বেগুনের জাতে সংযোজন করে বিটি বেগুন নামে কয়েকটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে যাকে Trangenic জাত বলা হয়। উদ্ভাবিত বিটি বেগুন এর জাত সমুহ হাইব্রিড না হওয়ায় নিজেদের বীজ নিজেরাই উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে পারবে। বিটি বেগুনের খাদ্যমান এবং রাসায়নিক উপাদানসমূহ দেশী বিদেশী উন্নত গবেষণাগারে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এতে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন উপাদান পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে পুষ্টিমাণ বিবেচনায় এটি প্রচলিত বেগুনের অনুরুপ। এ ছাড়া বেগুন একটি স্ব-পরাগায়িত উদ্ভিদ বিধায় স্থানীয় জাতের বেগুন বিটি বেগুন দ্বারা পরাগায়িত হওয়ার কোন সুযোগ খুবই কম। বিটি বেগুনের জীন স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করা হয়েছে, এক্ষেত্রে জিন মিশ্রণ জনিত কারণে স্থিতিহীন হওয়ার সম্ভাবনা কম। সকল প্রকার প্রজনন পদ্ধতির মধ্যে এগ পদ্ধতি খুব নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত ও অনিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি পাওয়া যায়নি যা মানব স্বাস্থ্য, জীবজন্তু ও পরিবেশের জন্য কোন কুফল বয়ে আনতে পারে।জিএম ফসলের আধিপত্যের কথা বলা হয়ে থাকে, যার ফলশ্রুতিতে দেশীয় জাত হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। বাংলাদেশে এখনও কোন এগ জাত উদ্ভাবিত হয়নি যার ফলে আমাদের নিজস্ব আদিজাত হুমকির সম্মুখীন হবে। তবে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে সক্ষম এমন জাত উদ্ভাবনের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং জিএম একটি সম্ভাবনাময় লাভজনক পদ্ধতি। সুতরাং এ নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। যুগে যুগে মানবকল্যানে প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হবে এবং তা মানবকল্যানে ব্যবহৃত হবে এটাই স্বাভাবিক। গবেষক হিসেবে আমাদের থেমে থাকলে চলবে না। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গ্রহণ করার মানসিকতা আমাদের থাকতে হবে। এই প্রযুক্তি বাংলাদেশের মত জনবহুল ও ক্রমহ্রাসমান আবাদি জমির দেশে খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলায় উৎকৃষ্ট পন্থা হিসেবে বিবেচিত হবে” ।

 অত্যন্ত সুখের বিষয় হলো বিগত ২২ জানুয়ারী, ২০১৪ ইং বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিটি বেগুনের চারটি উন্নত জাত - বিটি বেগুন ১, ২, ৩ ও ৪ এর উৎপাদিত চারা সমূহ মাননীয় কৃষি মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি কর্তৃক কৃষকদের মাঝে বিতরণের উদ্দেশ্যে ঢাকাস্থ বিএআরসি মিলনায়নে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশের চারটি জেলার বিশ জন কৃষকের মাঝে চারাগুলো বিতরন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বিএআরআই এর বিজ্ঞানী কর্তৃক এই উদ্ভাবনকে কৃষি বিপ্লবের মাইল ফলক হিসেবে উল্লেখ করেন। উদ্ভাবিত উল্লেখিত বিটি বেগুন সমূহ এদেশের কৃষকদেরকে সন্দেহাতীতভাবে আবাদ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। বিটি বেগুন চাষের ফলে এদেশে কীটনাশক এর ব্যবহার অনেকাংশে কমে আসবে যার ফলশ্রুতিতে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে মুক্ত হবে। পাশাপাশি বেগুনের উৎপাদন খরচও আশাতীতভাবে কমে আসবে। অনুরূপভাবে কৃষি ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ভবিষ্যতে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। পরিশেষে তিনি বিজ্ঞানীদের এই উদ্ভাবনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

 সেই থেকে বাংলাদেশে বিটি বেগুন সম্প্রসারিত হচ্ছে।দেশি প্রচলিত আরো ভাল জাতের বেগুনের মধ্যে এই জিন সম্প্রসারণের জন্যে কৃষি গবেষণা ইন্সটিটউটের বিজ্ঞানীরা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন।

তথ্য সুত্র: ইন্টারনেট ও বিএআরআই নিউজ বুলেটিন।